ISSN NO. 2349-2457

উত্তরণ

শীত সংখ্যা ● ডিসেম্বর ২০১৪ ● ৪০ টাকা

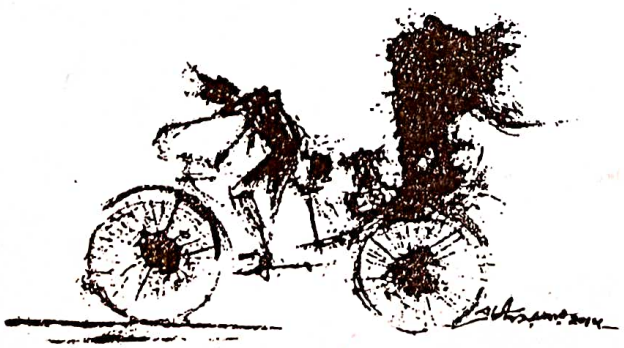

ষাণ্মাসিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা ঃ পৌষ ১৪২১ ঃ ডিসেম্বর ২০১৪
Uttarbhasha December 2014 Vol - 5 Issue - 2

সূচিপত্র ঃ-

সম্পাদকীয় ।। ৩

প্রবন্ধ ঃ

হে সখা- চিরসখা ।। পীযূষ ভট্টাচার্য ।। ৪

দেশ ভাগ ভয়ের সংস্কৃতি ও পীযূষ ভট্টাচার্যের সূর্য যখন মেষ রাশিতে ।।
রিপন সরকার ।। ৯

হকার কথা ।। দেবশ্রী ভট্টাচার্য ।। ৪০

গল্প ঃ

ট্যুশানি ।। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সান্যাল ।। ১৪

পচা পেঁয়াজের গন্ধ ।। নীহারুল ইসলাম ।। ২১

অনির্বান বন্দোপাধ্যায়ের অনুগল্প ।। ২৬

মাংস ।। শুভ্রদীপ চৌধুরী ।। ৪৪

সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ।। বরুণ তালুকদার ।। ৫১

যেখানে জীবিতরা নিষিদ্ধ ।। কৌশিকরঞ্জন খাঁ ।। ৫৬

কবিতা ঃ (২৭ - ৩৯)

বিজলী সাহা, মনিদীপা বিশ্বাস কীর্তনীয়া, শ্যামল, বিশ্বজিৎ লায়েক, প্রদীপ কুমার
রতন দাস, উৎস রায় চৌধুরী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সুরজ দাশ

দেশভাগ, ভয়ের সংস্কৃতি ও পীযূষ ভট্টাচার্যের সূর্য যখন মেষ রাশিতে

রিপন সরকার

দেশভাগ-দেশত্যাগ নিয়ে বেশ কয়েকটি উচ্চমানের গবেষণা সত্ত্বেও এখনও এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে যে দেশভাগ-দেশত্যাগের মতো ট্র্যাজিক বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় তেমন উচ্চমানের উপন্যাস লেখা হয়নি। অশ্রুকুমার সিকদারের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের নামই হলো 'ভাঙা দেশ, ভাঙা মানুষ, বোবা বাংলা সাহিত্য।'(১) তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, দেশভাগ নিয়ে বাংলা সাহিত্য অনেকটাই নীরব।'(২) দেবেশ রায় লিখেছেন, তেমন সাহিত্য-শিল্প রচিত হয়নি বাংলার এই ভূখন্ডে যাতে দেশভাগ-স্বাধীনতার বেদনা ইতিহাসের সময় পেরিয়ে সংবাহিত হয়ে যেতে পারে। '(৩) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''বাংলাভাষায় দেশবিভাগ নিয়ে তেমন স্মরণীয় সাহিত্য যে রচিত হয়নি, তার একটি কারণ সম্ভবত এই যে, দ্বিধাদ্বন্দ্বের জড়তাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল লেখকদের একটা বড় অংশকে।''(৪) হাসান আজিজুল হক তার 'কথাসাহিত্যের কথকতা' গ্রন্থে লিখেছেন, ''যারা কখনোই, কোনো কারণেই দেশত্যাগ করবে না,দেশত্যাগের কল্পনা পর্যন্ত যাদের মাথায় আসেনি, তাদের যখন হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে -- আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সেই বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা কেউ লেখেননি।'(৫)

অবশেষে এই নীরবতা ভাঙতে শুরু করলো ১৯৭০-৭১ -এ এসে। অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রমেশচন্দ্র সেন, অজিত দাস, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অসীম রায়, প্রফুল্ল রায় প্রমুখের বেশ কিছু ছোট গল্প ও উপন্যাস সত্তরের আগেই লেখা যেগুলিতে দেশবিভাগ ও বিভাগোত্তর পরিস্থিতির প্রসঙ্গ আছে। যে 'নীরবতা'র কথা সিকদার, রায়, বন্দ্যোপাধ্যায় বা হক সাহেবরা বলেছেন তা এইপর্বে সেভাবে বাঙ্ময় হয়ে ওঠেনি, অন্তরাত্মা ফাঁপিয়ে দিয়ে যায়নি। বরং দেবেশ রায়ের(৬) তথ্য ও বিশ্লেষণ এ বিষয়ে আমাদের পথ দেখাতে পারে ঃ

> শিল্প সাহিত্যে নীরবতা ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে ভিতরের দিকে টান দেয় অনেক সময়। আবার সেই নীরবতাই স্থায়ী হয়ে যেতেও পারে। পঞ্চাশ বছর ধরে গল্পে ও উপন্যাসে সেই নীরবতা কি আমাদের লেখকদের মধ্যে তেমন কোনো টান দিয়েছে জলের অতল মাটির দিকে ? অথবা আমরা সেই নীরবতাকেও ভুলে গেছি, ভুলে আছি ?

তেমন একটি আন্দাজের জন্য বোধ হয় ১৯৭০-৭১ বছরটিকে ধরা যায়। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ হওয়ার পর বাংলা গল্প উপন্যাসে দেশভাগ, স্বাধীনতা ও এই দুই বাংলার ভিতরের সম্পর্ককে নতুনভাবে কোনো- কোনো গল্পকার-ঔপন্যাসিক তাঁদের আখ্যান কল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছেন।

এই পর্বে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিও শ্রীরায়ের বক্তব্যকে সমর্থন করে। সত্তরের পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আখ্যানের নাম বলা যেতে পারে ঃ সমরেশ বসুর 'সওদাগর' (১৯৭১), 'খন্ডিতা' (১৯৮১); উদ্বাস্তুদের নিয়ে লেখা নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা ক্যাম্প' (১৯৭৮), 'বল্মীক' (১৯৮৩), 'অরণ্যদন্ডক' (পূর্বনাম নৈমিষারণ্য, ১৯৮৪); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' (১৯৭১), 'পূর্ব-পশ্চিম' (১৯৮৮); অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭১), 'মানুষের ঘরবাড়ি' (১৯৭৮); প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা' (২ খন্ড একত্রে ১৯৯৬ এবং ৩য় ও ৪র্থ পর্ব যথাক্রমে ২০০১ ও ২০০২ শারদীয় বর্তমানে, গ্রন্থাকারে ২০০৩), ভাগাভাগি (২০০১), গৌরকিশোর ঘোষের ট্রিলজি 'দেশ মাটি ও মানুষ', শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরি বনের সারি' (১৯৯০), শান্তা সেনের 'পিতামহী' (১৯৯৪), 'জন্মের মাটি' (২০০৭), সুনন্দা সিকদারের 'দয়াময়ীর কথা' (২০০৮) ইত্যাদি।

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে মেনে নেওয়াই যায় যে দেশভাগ নিয়ে রচিত উপন্যাসের সংখ্যা একেবারে নগন্য নয়। সেইসঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, বিষয় ও উপস্থাপনে বৈচিত্র্যের যে বহুতর সুযোগ আছে তার কাঙ্খিত স্তরে বাংলা উপন্যাসের যাত্রা অব্যাহত।

এই পথের এক উজ্জ্বল যাত্রী পীযূষ ভট্টাচার্যের (৩ ডিসে ১৯৪৬) উপন্যাস 'সূর্য যখন মেষ রাশিতে' (২০১৩)।

দেশভাগের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দাঙ্গা, অনিকেত মানুষের প্রব্রজন, তাদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট, সম্পত্তি ও সম্মান হারিয়ে নিঃস্ব মানুষের মর্মান্তিক বেদনার কথা, নারীর লাঞ্ছনা ইত্যাদি নানা বিষয় স্থান পেয়েছে উল্লিখিত উপন্যাসগুলিতে। কিন্তু পীযূষ ভট্টাচার্যের 'সূর্য যখন মেষ রাশিতে' উপন্যাসটি ভিন্ন পথে হেঁটেছে। তিনি দেখিয়েছেন একটি এলাকায় দাঙ্গা ছাড়াই, গণহত্যা তো দূরের কথা, হত্যা ছাড়াই কেমন করে সদ্য স্বাধীন একটি দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসাধারণের মধ্যে ভীতির বোধ সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়। এলাকার পীর-ফকির-গাজিরা ছিল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলেরই মান্যজন, তাদের অভিপ্রায়কে মর্যাদা দেওয়াই ছিল রীতি। সকল সঙ্কীর্ণ চিন্তাভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে সকল সম্প্রদায়কে রক্ষা করার ঐতিহ্যও আর রক্ষাকবচ হিসেব কাজ করতে

পারে না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ার ফলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতাবোধ তো ছিলই, তাকে উস্কে দেওয়া হলো নানাভাবে--শ্রেণি, গোষ্ঠী তথা কায়েমি স্বার্থ নেপথ্যে সক্রিয় থেকেই একাজ করল। বাংলাদেশের কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিক একে বলেছেন 'ভয়ের সংস্কৃতি'। এই 'ভয়ের সংস্কৃতি'র উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তরালের চিত্র ফুটে উঠেছে 'সূর্য যখন মেষ রাশিতে' উপন্যাসে। দাঙ্গা ছাড়া, রক্তপাত ছাড়া, প্রত্যক্ষ হুমকি ছাড়া, শারীরিক আক্রমণ ছাড়া এই ভয়ের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন এবং এর ফলশ্রুতিতে জগতে ও মননে মানুষের অনিকেত হয়ে যাওয়া-- আলোচ্য উপন্যাসটির মূল উপজীব্য এটাই। এখানেই দেশভাগ নিয়ে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে ব্যতিক্রমী হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে 'সূর্য যখন মেষ রাশিতে'।

ভারত উপমহাদেশের বিভাজন সংস্কৃতিতে এক নতুন উপাদান সংযোজিত করল -- তা হলো ধর্মকে ব্যবহার করে ভয়ের সংস্কৃতি গড়ে তোলা। এই নব্য উপাদানটির জন্ম-সম্ভাবনা আগেই দেখা দিয়েছিল কিন্তু এর উৎপাদন ও বিস্তার আগ্রাসী ভূমিকা নিল দেশভাগের পরেই। বাংলাদেশের বিখ্যাত সমাজবিদ্ আলী রীয়াজের মন্তব্য[৭] উদ্ধার করা যেতে পারে ঃ

> ভয়ের সংস্কৃতি হলো এমন এক আবহাওয়া ও পরিবেশ যেখানে আতঙ্ক, সন্ত্রাস ও বল একাধারে ক্ষমতার / শাসনের একটি ধরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের নির্ণায়ক। অর্থাৎ সমাজে উপস্থিত শ্রেণী / গোষ্ঠী / ব্যক্তিসমূহের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে জবরদস্তি, স্বেচ্ছাচারিতা। জাতিক, লিঙ্গজ, সম্প্রদায়গত, শ্রেণীগত সম্পর্কের ভিত্তি হলো আতঙ্ক, সন্ত্রাস ও বলপ্রয়োগের প্রত্যক্ষ / পরোক্ষ উপস্থিতি। উল্লেখ করা দরকার যে, আতঙ্ক সৃষ্টি, সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিচালনা বা বল প্রযুক্ত হওয়ার ঘটনা প্রতি ক্ষেত্রেই ঘটতে হবে এমনটি জরুরি নয়...। আতঙ্ক, সন্ত্রাস, বল প্রয়োগের যে কোনো একটি ঘটতে পারে এই বোধই যথেষ্ট। ভয়ের সংস্কৃতি এই অর্থে একটি নির্মিত বা তৈরি করা মানসিক অবস্থা। এই অবস্থা ও পরিবেশ যখন প্রবল হয়ে ওঠে এবং সমাজের ভেতরে এরই ভিত্তিতে প্রাবল্য ও অধস্তনতা সৃষ্টি হয়, তখনই আমরা বলতে পারি যে ভয়ের সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে ঐ সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'সূর্য যখন মেষ রাশিতে' উপন্যাসে আলী রীয়াজ ব্যাখ্যাত ভয়ের সংস্কৃতির ভিত্তি হলো প্রধানত ধর্মীয় সম্প্রদায়গত, ততটা জাতিক বা লিঙ্গজ নয়। ধর্ম মূলত ব্যক্তিগতভাবে আচরণীয় হলেও ব্যক্তির জীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে তা কাজ করতে থাকে। আর কেউ এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করলে তাকে একই সঙ্গে রাষ্ট্র ও ধর্মের বিরোধিতা আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে চাপা দেওয়া হয়। 'সূর্য যখন মেষ রাশিতে' উপন্যাসটিতে

বিশেষ একটি সম্প্রদায় নির্মিত ভয়ের সংস্কৃতির পাশাপাশি এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বার সমান্তরালভাবে সোচ্চার থেকেছে কাহিনির কাঠামোর মধ্যেই, ঔপন্যাসিককে আলাদা করে তত্ত্বকথা ন্যারেট করতে হয়নি। উপন্যাসেই সেই অসামান্য ব্যালান্স তিনি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, লেখকের নৈতিকতা এখানে ধ্বস্ত হয়নি।

দেশভাগ নিয়ে উপন্যাস লেখার একটি সমস্যা হলো ঃ "এই হিংসাকে আমরা কিভাবে দেখব এবং কাকে আমরা হন্তারক বলে চিহ্নিত করব।"(৮) -- এই সংকট থেকে নিজেও মুক্ত থেকেছেন, পাঠককেও মুক্তি দিয়েছেন। ভয়ের সংস্কৃতির সমান্তরাল শক্তি বিন্যাস আখ্যানটিকে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট করে তুলবে, সন্দেহ নেই।

উপন্যাসটির ভেতরে যে চাপা টেনশনের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে তা এর নামকরণ থেকেই উপলব্ধ হয়। পুরাণ থেকে জানা যায় সাধকেরা একটা দিক উন্মুক্ত রেখে সাধনায় বসতেন। যেমন বুদ্ধদেব সাধনায় বসেছিলেন পূর্ব দিক খোলা রেখে। কিন্তু সূর্য যদি মাথার উপরে থাকে তবে কোনও দিক খোলা থাকে না। সূর্য মেষ রাশিতে থাকে এপ্রিল মাসে, একদম মাথার উপরে। উপন্যাসের চরিত্রগুলিরও যেন সব দিক বন্ধ হয়ে গেছে, কোনও দিকই আর উন্মুক্ত নয়। ভীতির পরিবেশ মানসিকভাবে উদ্বাস্তু করে দেয় হিন্দুদের। সমান্তরাল যে শুভশক্তি তাদেরও যেন মাথার উপর সূর্য, সব রাস্তাই মিশেছে এক রাস্তায়।

এই শুভশক্তির বাহক হচ্ছে উপন্যাসের ঘটনাস্থল দেওয়ানি হাটের ফকিররা। বিশ্বাস যে, ফকির দেওয়ান গাজি এসেছিলেন তুর্কি থেকে। যেখানে এমন সাধকেরা যান, সেখানে যেন ঈশ্বরের বীজ রোপণ করে যান। সামান্য জায়গা নিয়ে শুরু করে দেওয়ান গাজির দরগা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল এগারো কাঠায়। তার ফরমানই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে আইন-আদালত-হুকুমনামা। এই বিস্তারের মধ্যে কোনো রক্তপাত নেই। সেকারণে উপন্যাসে প্রত্যক্ষ কোনো দাঙ্গার কথা বলা নেই। যা আছে তা হলো মানসিক দাঙ্গা, মানসিকভাবে আগে উদ্বাস্তু করে দেওয়ার কথা, মানসিকভাবে উদ্বাস্তু মানুষ তো একসময় নিজের শরীরটাকেও উদ্বাস্তু করে দেবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এই উপন্যাসে অনেক প্রতীক ও সংকেতের ব্যবহার আছে। ঘটনার ঘনঘটার চাইতে ঘটনার প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ আছে বেশি। সেই কারণেই প্রতীক ও সংকেতের বহুল অথচ সার্থক ব্যবহার। এই ব্যবহারে কোনো অতিরঞ্জন নেই, আবার উচ্চকিত প্রকাশে পাঠকের প্রতি অবিশ্বাসও নেই। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ব্রিটিশ আদালতের প্রয়াত জুরির নিজের হাতে লাগানো লিচু গাছে প্রচুর বানর আসে। তাদের তাড়াবার জন্য পিসিমা (জুরির স্ত্রী) বাড়ির আশ্রিত খইমুদ্দিনকে দিয়ে ক্যানেস্তরা টিনের ঘন্টা বাজান। ক্যানেস্তরার টিনের এই আওয়াজ নানা সময়ে নানান শব্দ তুলে পাঠককেই যেন সচকিত করে দেয়। ওই আওয়াজ শুধু পশু-পাখিকেই সন্ত্রস্ত করে না, কখনও তা আত্মরক্ষার জন্য, কখনও তা বিপদসংকেত হয়ে বেজে ওঠে।

আবার কখনও তা হিন্দু বাড়ির প্রতীক হয়ে পাশে নতুন তৈরি হওয়া মসজিদের আজানের সঙ্গে অসম লড়াইতে নামে,হেরে যায়। হেরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, হেরে যায় ভয়ের সংস্কৃতির কাছে। তখন আর তা ক্যানেস্তারা টিনের শব্দমাত্র থাকে না, তা এক নতুন প্রতীকের, নতুন সংকেতের দ্যোতনা বহন করে।

য়ুরগেন হাবারমাস 'দ্যা নিউ কনজারভেটিজ্‌ম' (১৯৮৯) গ্রন্থে নাৎসি বর্বরতার প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এই স্মৃতিকে যদি আজ আমরা ভুলে যাই, তাহলে গোটা একটা প্রজন্মের প্রতি আমরা চূড়ান্ত অবিচার করব। একই কথা বলা চলে দেশবিভাগ ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে উপন্যাসই চাইব, তারপরে ইতিহাস। পীযূষ ভট্টাচার্যের উপন্যাস সেই আকাঙ্ক্ষাকে আরও বাড়িয়ে দিল।

উৎস নির্দেশ ঃ

১) প্রথম প্রকাশ ঃ অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৪১১। 'ভাঙা বাংলা সাহিত্য' - শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত হয় ২০০৫-এ।

২) অশ্রুকুমার সিকদার, ২০০৫, 'ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য' কলকাতা ঃ দে'জ, পৃ ৯০।

৩) দেবেশ রায় (সংকলন ও সম্পাদনা), ২০০৫ / ২০০৯, 'রক্তমণির হারে' ১ম খন্ড, নতুন দিল্লি ঃ সাহিত্য আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

৪) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৯ / ২০০১, 'দেশভাগ ঃ স্মৃতি আর সত্তা', কলকাতা ঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ ২।

৫) উল্লেখ, অশ্রুকুমার সিকদার, ২০০৫, পূর্বোক্ত, পৃ ২১।

৬) পূর্বোক্ত, পৃ ২৮।

৭) আলী রীয়াজ, ১৯৯৪, 'ভয়ের সংস্কৃতি', ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশ।

৮) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ১।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

আকর গ্রন্থ ঃ

পীযূষ ভট্টাচার্য। ২০১৩। সূর্য যখন মেষ রাশিতে। কলকাতা ঃ ভাষাবন্ধন।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ঃ

অশ্রুকুমার সিকদার। ২০০৫ । ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য। কলকাতা ঃ দে'জ ।

আলী রীয়াজ। ১৯৯৪। ভয়ের সংস্কৃতি। ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশ।

উদয়চাঁদ দাশ। ২০০৭। ছোটোগল্পের বর্ণালী ঃ কথা থেকে শৈলী। কলকাতা ঃ রত্নাবলী।

তারক সরকার। ২০০৯। বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ। কলকাতা ঃ অরুণা।

দেবেশ রায় (সংকলন ও সম্পাদনা)। ২০০৫ / ২০০৬। রক্তমণির হারে। নতুন দিল্লি ঃ সাহিত্য অকাদেমি

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৯ / ২০০১। দেশভাগ ঃ স্মৃতি আর সত্তা। কলকাতা ঃ প্রগ্রেসিভ।

সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত। ২০০২। বঙ্গসংহার এবং। কলকাতা ঃ নয়া উদ্যোগ।